

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)****A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**

Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 818 - 823

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

দুঃখের জোয়ারে ভাসমান তিতাস পাড়ের মালোগোষ্ঠী

রিমা রায়

Email ID : royrima.8536@gmail.com**Received Date** 20. 12. 2024**Selection Date** 01. 02. 2025**Keyword**

Malo group,
Titus River,
Fishermen,
Floating,
Culture,
Livelihood,
Social system,
Crisis.

Abstract

If you go through history, it can be seen that most of the world's civilizations were developed in the areas along the sea and river banks. Similarly, the village of Gokarna was raised on the banks of titas river, about three miles from Brahmanberia in Comilla district of undivided Bengal in subjugated India. Writer Advaita Mallavarman was born in a very poor Malla family in that village. And the novel 'Titas Ak Nadir Naam', rich in narrative of the lower classes written by him, is established as an immortal achievement. There is no touch of civilized civility in the so-called civil life, no political manipulation, only the struggle for livelihood of the group-centered life of the lower classes of human society. The life terms of the neglected people of Bengal were written in the writer's pen, probably with the urge to express their unspeakable pain in public. River and life are united in his writing. The river has given food to the mouths of the people on its banks, has created the emotions of the mind, the colors of the eyes, and life is an epic of pain. Malos have an inseparable relationship with the river Titus. It is on the banks of the river Titus that the birth, youth, youth, old age and all the rituals of the Malo family unfold. How important the role of the river in their lives is throughout the novel. The survival of the Malos is completely dependent on the river. Most of the people of Titus Par live by fishing. They have to catch fish from the water at night. There Titus is calm or fearless, so many mothers and wives are not afraid even in the night of the storm and the sons and husbands are sent to the river. The wives think that the husband is in their arms, the mothers think that the sons are just resting their heads on the mother's chest and calmly making a net full of fish. This Titus is the only companion in the life of Malos and this companion is forever. Without Titus, they cannot function, it has a part in every work of life, its name is closely associated with it, its constant intermingling with the work of daily life. The path that started from the courtyard of the house of all the malos all went and joined the water of Titus. They are even so attached to this name that the Titus necklace hangs around their necks. But this much dependence may have led the lives of Malo people to danger. Fishing was the only profession of the Malos who survived by adopting Titus but with the passage of time this profession is no longer active due to the drying up of the river water. As the water in the river dried up, the Malora became immobile. A dire crisis has arisen in their lives, due to which the Malos are gradually

moving towards destruction. So dependence on one river and one occupation has become the norm for Malo clans. The Malos could not bring any change in their lives according to time; So with the past they also became extinct. It is true that the Malos could not grasp the present, but Titus's history tied their own past to it.

Discussion

“নদীর একটা দার্শনিক রূপ আছে। নদী বহিয়া চলে; কালও বহিয়া চলে। কালের বহার শেষ নাই। নদীরও বহার শেষ নাই।”^১

উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে তিতাসের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ সমগ্র বিষয়বস্তুকে যেন একটি লাইনের মাধ্যমে ধরে দিয়েছেন। কেননা এই তিতাসের সঙ্গেই ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে মালোগোষ্ঠীর জীবনসংগ্রাম। তিতাস যেমন বয়ে চলেছে সেই বাহমনতাকে ঘিরেই বইছে মালোদের জীবনস্রোত। তাইতো তার বুকে থেকে গেছে অজস্র ঘটনা। মানব জীবনের বাস্তব রূপকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ সেই ঘটনাগুলিকেই বাস্তবায়িত করেছেন। শরতের মেঘগুলিতে জল না থাকলেও জল থাকে তিতাসের বুকে। তাইতো চির অবহেলিত মালোদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন এই নদী। শুধু মালোদের বললে ভুল হবে, কৃষকদের জীবনও পরোক্ষভাবে নির্ভর করেছে নদীর ওপরেই। তিতাসের তীরে যেখানে বালু মাটির চর জমে সেখানেই চাষ করেন চাষিরা। তেমনি চাষী সারকরন্দ ও জোবেদ আলী। নদী পাড়ের গ্রামগুলির মাঝখানে থাকে ধান জমি। চাষিরা ধান কাটা শেষ করে এদিকের ধান ওদিকে বয়ে নিয়ে যেতে তিতাসকেই কাজে লাগায়। আর মালোদের তো সমগ্রটাই নির্ভর করেছে তিতাসের ওপর। উপন্যাসের শুরুতে ‘প্রবাস খন্ডে’ মাঘমন্ডলের ব্রত পালনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় মাঘ মাসের ত্রিশ দিন তিতাসের ঘাটে প্রাতঃস্নান করে ব্রত শেষে বানানো চৌয়ারিকে তিতাসের জলে বিসর্জন দিয়েই ব্রতের শেষ করতে হয়।

বেঁচে থাকার জন্য সমগ্র প্রাণী জগৎকেই নিজেদের আহার ব্যবস্থা করতে হয়। আর তার মধ্যে মানবজাতির তো কথাই নেই, তাদের সচ্ছল জীবন ধারণের জন্য থাকে বিভিন্ন ধরনের জীবিকা। তেমনি মালোদের প্রধান জীবিকা হল ‘মাছ ধরা’। মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করেই নিজেদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায় মালোরা। তাই হয়তো পাঠশালার পড়াশোনার জীবন থেকে এ জীবন তাদের বেশি ভালো লাগে। তাই লেখাপড়ায় হাতেখড়ি পড়ার আগেই পড়ে যায় নাওজালে হাতেখড়ি এবং একসময় পাকা জেলে বলে তাদের নামও হয়ে যায় সমাজে। তবে মালোর ছেলেদের কাছে এটা কোন দায়বদ্ধতা নয় বরং ভালোলাগা এবং ভালোবাসাও বলতে পারি। আর সেই ভালোবাসার স্রোতেই তাদের জীবন বহমান। ‘জন্ম বিবাহ মৃত্যু’ এই তিন নিয়েই মানব সংসার। এই তিনের সাহায্যেই প্রকৃতি তার ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। মালোরাও এই তিন ব্যাপারেই পয়সা খরচ করে, ধুমধাম করে উৎসব পালন করে। সমাজে এই মালোরা নিম্নবর্ণীয় অবহেলিত জনজাতি। তাই উৎসব অনুষ্ঠানে সকলেই পয়সা খরচ করতে পারেনা। তবে যারা পারে তারা অত্যন্ত সমারোহের সাথেই খরচ করে থাকে। এক একটি শিশুর জন্মের উৎসব করে থাকে অত্যন্ত জাঁকজমক এর সাথে, অন্নপ্রাশন করে আরো জাঁকিয়ে। তবে তাদের জীবনে বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই বিবাহের ব্যাপারে খরচই তাদের সবচেয়ে বেশি আনন্দ দিয়ে থাকে। বিবাহ করে সুখ, দেখেও আনন্দ।

তাছাড়াও তাদের প্রবাহমান জীবনে অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠান তো রয়েছেই। কালী পূজোতেই হয় তাদের সবচেয়ে বেশি সমারোহ। পূজোর এক মাস আগে থেকেই বিদেশ থেকে কারিগর এনে মূর্তি বানানো হয়। চারদিন ব্যাপী যাত্রা ও কবিগানের মধ্যে দিয়ে পূজোর সমাপ্তি ঘটানো হয়। এবং তারপরেই তাদের জীবনে আরেকটি অনুষ্ঠান গুরুত্ব পায় তা হল উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির দিনে পিঠে-পার্বণের অনুষ্ঠান, কালীপূজোর সময় গান-বাজনা আমোদ আহ্লাদে মালোরা অনেক টাকা খরচ করে, কিন্তু খাওয়া দাওয়ার জন্য খরচ করে এই উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির দিনেই। তবে জীবন মানে শুধু হৈ-হুল্লোর নয় সেখানেও থাকবে নিরাশা-হতাশা-দুঃখ এর ওঠানামা। তাই মালোদের জীবনে সুখের জোয়ার যেভাবে আসে তেমনি ভাবে আসে দুঃখের বন্যা। আর তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেখা যায় রামকেশবের ঘরে। রামকেশবের একমাত্র সখল ছিল তার

পুত্র কিশোর। কিশোর-ই ছিল রামকেশবের সেসব দিনের সম্বল যেসব দিনে রামকেশব বৃদ্ধ সহায়হীন। কিন্তু সেই কিশোর-ই জোয়ান বয়সে প্রবাস থেকে ফিরে আসে পাগলাবস্থায়। উল্টে রামকেশবের কাঁধেই দায়িত্ব এসে পড়ে ছেলেকে সামলাবার। একমাত্র সম্বল বা নির্ভরতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে রাম কেশবের দুর্দশা আমাদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। তাই রামকেশবের বুক ভরা আক্ষেপের সুর আমাদের কানকে এড়িয়ে যেতে পারেনি।

“হায়রে বিধাতা, হায়রে উপরোদ্ধা, একি করলে, কোন পাপে তুই আমারে এ শাস্তি দিলে। সাধ করেছিলাম জোয়ান পুত্রের কামাই খামু, তারে বিয়া শাদি করামু, বউ ঘরে আনুম, নাতি কোলে নেমু। হায়রে আমার কপাল।”^২

উপন্যাসের শুরুতে লেখক মালো গোষ্ঠীকে একবার সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন কিশোর নামক যুবকের ভবিষ্যৎ ভাবনার মধ্যে দিয়ে। শুকদেবপুরে থাকা অবস্থায় কিশোর দেখেছিলেন, শুকদেবপুরের বাসিন্দাদের জাল যেমন আছে তেমনি হালও আছে। প্রত্যেক বাড়িতেই জালের এবং হালের সরঞ্জাম পাশাপাশি রয়েছে। একদিকে নদী মাছে ভরভর, আরেকদিকে মাঠ ফসলে হাসিহাসি থাকে। কোনদিন যদি কোন অদৃশ্য শয়তান এসে তাদের জালের গিঁটগুলি খুলে দেয়, নৌকার লোহার বাঁধগুলি আলগা করে ফেলে আর নদীর জল চুমুক দিয়ে গুশেও নেয় তাও এরা (শুকদেবপুরের বাসিন্দা) মরবে না। তাই গোকনঘাট গ্রামের বাসিন্দা হিসাবে কিশোর এর ভাবনা এসেই যায় তিতাস পাড়ের মালোদের তো কারুর ক্ষেত খামার নেই। কিন্তু সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাতে গিয়ে, একজন মালোর ছেলে হয়ে বুকুর মাঝে সে সাহস জোগাতে পারেনি লেখক। তাইতো কিশোর এর মুখে বসিয়ে দিয়েছেন –

“আমাদের গাঁয়ের মালোদের কারো ক্ষেত খামার নেই। কিন্তু তিতাস আছে, তাকে শোষণ করিবে কে।”^৩

সত্যিই এটা মালোদের ভাবনার থেকে অনেক দূরে যে, তিতাস কোনদিন শোষিত হবে। আর মালোদের জীবন যেখানে তিতাসকে ছাড়া অচল সেখানে কেনোই বা ভাববে তিতাসকে ছাড়া।

জন্মসূত্রই মালোরা জেনে এসেছে তিতাস এর সঙ্গে তাদের জীবনের বাঁধন এক সূত্রে গাঁথা। তার জন্য নদীর বিষয়ে একই রহস্য মালোদের বারবার শুনেও আনন্দ এবং শুনিয়েও আনন্দ। যতই সে রহস্য পূর্বশ্রুত হোক না কেন তাদের রোমাঞ্চে বিন্দুমাত্র হেরফের হয় না রহস্যের পুনরায় উন্মোচনে। তারা যতই শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়ুক না কেন নিদ্রার কোলে আশ্রয় নেবার সময়ও তারা অনুভব করতে পারে তিতাসের জলের আসন-বসন। ‘নয়া বসত’ খন্ডে লেখক দেখিয়েছেন প্রথমবার নৌকাতে উঠে অনন্ত আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। বারংবার সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে ‘বড়-গাঙ’ দেখার স্বপ্নের মধ্যে। তবে মালোর ছেলে হিসাবে এটা যেন তার স্বভাবসিদ্ধ অধিকার। আর এই অধিকার এর জোরেই বোধহয় গোকনঘাটের মালোরা তাকে এবং তার মাকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিল। তবে শুধু অধিকারের জোরে বললে ভুল বলা হবে। কেননা তিতাস পাড়ের মালোদের ছিল সাধারণ মানুষের প্রতি অসাধারণ প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার নিবিড় বন্ধন। সেই বন্ধন এর কিছুটা দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে সুবলের বউ বাসন্তীর অনন্তের মায়ের প্রতি। দুজনেই সমবয়সী এবং অল্প বয়সে বিধবা তাই হয়ত সমবেদনার নিঃশ্বাস বাঁধ মানতে পারেনি। একজন অপরজনকে দেখিয়ে দেয় কাজের পথ, সেখানে জীবন খুব সচ্ছল না হোক সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা যায়। মালোদের মাছ ধরার জীবিকা যতদিন আছে নাও-জালের কাজ ততদিন থাকবে। তাইতো পরিবারের পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও সক্ষম হয়ে যায় জাল বোনার কাজে।

কাজ যতই ভালো এবং ভালোবাসার হোক না কেন তাদেরকে থাকতে হয় কোন না কোন না কোন মালিকানার ভেতরে। যেমন মাটির মালিক থাকে জমিদার, যদিও জমিদাররা নিজেরা এসে কখনোই সে মাটিতে ঘরবাড়ি বাঁধেনা তবুও ঘুরে ফিরে তারাই মাটির মালিক হয়। আর শোষক-শোষিতদের টানাপোড়ান এর কথা তো আমাদের কারোরই অজানা নয়। তাইতো তিতাস এর সঙ্গে মালোদের জীবন এক সূত্রে বাঁধা থাকলেও তারা শোষিত শ্রেণী মাত্র, শোষণ করে অন্যকেউ। লেখকের ভাষায়–

“তিতাসের মালিক জেলেরা। কাগজপত্রের মালিক আগরতলার রাজা। মাছ ধরার মালিক মালোরা।”^৪

তবে সেই মাছে শুধুমাত্র মালোদের অধিকার আছে তাও নয়। রাজবাড়ীতে নির্দিষ্ট দিনে দশভার করে মাছ দিতে হয় মালোদের। তবে বর্তমানে প্রচলিত ভিন্ন ব্যবস্থা। মালোদের দশজন এর প্রধান মাতব্বর রামপ্রসাদ স্বয়ং সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এক সময় জগৎ বাবু এবং আনন্দ বাবু বাজার বসাত। আর সেই বাজারে মালোদেরকে পশরা সাজানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। মালোদের কাছে আসা এই অনুরোধ প্রেরিত হলো বড় মাতব্বর রামপ্রসাদের কাছে। রামপ্রসাদ আনন্দ বাবুর শর্তে (প্রত্যেককে ২৫ টাকা নগদ এবং একখানা করে ধূতি) রাজি হয়ে তাদেরকেই পান তামাক খাওয়ান। পরিনামস্বরূপ মালোরা মাছের ভার নিয়ে আনন্দবাবুর বাজারে পশরা সাজায়। কিন্তু সে ব্যবস্থায় আজ ঘুন ধরেছে। দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার চিরপ্রসিদ্ধ তাইতো মধ্যসত্ত্বাভোগী দালালের রক্ত চক্ষুকে মালোরা ফাঁকি দিতে পারেনি। মোড়ল-এর আশ্বাস পেয়ে একজন ভুক্তভোগী জানায় –

“আনন্দবাজারে মাছ বিক্রেতাদের কাছে এখন জমিদারের লোকে মাশুল চাইতে শুরু করিয়াছে। মাছের ভার পিছু দুই আনা করিয়া মাশুল না দিলে বলিয়া দিয়াছে মালোদিগের বাজারে বসিতে দিবে না।”^৫

জাতিভেদের তারতম্যও কিছুটা রয়েছে উপন্যাসে। তামসীর বাপের চরিত্র বিশ্লেষণে তার কিছুটা বর্ণনা পাওয়া যায়। তামসীর বাপ কায়েতদের সাথে মেলামেশা করে ঠিকই কিন্তু তারও কোথাও গিয়ে অনুশোচনার জায়গা তৈরি হয়েছে। তার নিজেরও দশজনের সভায় বসে মনে হয়েছে পাড়ার মধ্যে ঐক্য রাখা ও পাড়ার স্বার্থ দেখাই সর্বাগ্রে কর্তব্য। কায়েতরা যতই তার সাথে মেলামেশা করুক তারা মালোদের ঘরে নেয়না, মালোরা কোন জিনিস ছুলে সেই জিনিকে তারা অপবিত্র মনে করে। আর দশজনের সভায় তো তামসীর বাপকে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয় –

“ভাবিয়া দেখো কায়েতের সঙ্গে মিশিতেছ বলিয়া তারা তোমাকে কায়েত বানাইবে না। তুমি মালোই থাকিবে। তারা তোমার বাড়ি আসিলে যদি সিংহাসন দাও, তুমি তাদের বাড়ি গেলে বসিতে দেবে ভাঙা তক্তায়। তুমি রূপার হুকাতে তামাক দিলেও, তোমাকে দিবে শুধু কলকেখানা।”^৬

দশজনের সভায় দয়ালচাঁদ এর এই সতর্কবার্তার মধ্যে দিয়ে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা শিক্ষিত নাই হতে পারে কিন্তু সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে অসচেতন নয়। তাদের অগোচরে কিছুই নেই। তাইতো প্রতিবাদ না জানাতে পারলেও নিজেরা নিজেদেরকে সচেতন করতে জানে।

প্রবাহমান জীবনধারায় মৃত্যু যন্ত্রণা থাকবে না তা কখনোই সম্ভবপর নয়। তবে সেই বেদনাকে সময়ের সাথে ভুলিয়ে দিয়ে মানুষকে এগিয়ে যেতে হয়। মালোরাও তেমনিভাবে এগিয়ে গেছে জীবনের পথে। মালোপাড়ায় সুবলের মৃত্যুটা বড়ই মর্মান্তিক। কালো বরণের বড় নৌকায় জিয়লের খেপ দিতে গিয়ে মেঘনা নদীতে তুফানের সম্মুখীন হয় তারা। তীরে নেমে তরী বাঁচাতে গিয়ে উৎসর্গ করতে হয় সদ্যবিবাহিত যুবক সুবলের প্রাণ। কিন্তু তাতে করে সুবলের স্ত্রী বাসন্তীর জীবন থেমে থাকেনি। তাকেও সময়ের সাথে সব দুঃখ কষ্ট বেদনা ভুলে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে হয়েছে।

“চার-পাঁচ বছরে সে অনেক কিছু ভুলিয়াছে। স্বামীর জন্য তার আর কষ্ট হয় না। স্বামী বড় নিদারুণ মৃত্যু মরিয়াছে। এ কথা মাঝে মাঝে মনে হয়।”^৭

এছাড়াও রামকেশবের বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র অবলম্বন কিশোর পাগলাবস্থায় দিন কাটালেও তার মৃত্যুও ব্যাখ্যাত করেছিল মালোদের। আর বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত করেছিল অনন্তের মাকে। যার পরিনামস্বরূপ চার দিন এর মাথায় অনন্তের মাকেও মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে হয়। তবুও মাকে ছাড়া বেঁচে থাকে অনন্ত, বেঁচে থাকতে হয় তাকে, তাও রীতিমতো লড়াই করেই। কারণ সমাজে পিতৃমাতৃহীন সন্তানের দুর্ভোগ-দুর্দশার তো শেষ হতে দেখা যায় না। তারপর একে একে আরো অনেক মৃত্যুই দেখা গেছে তিতাস পাড়ের মালোগোষ্ঠীদের মধ্যে। যা সমাজে অনেকটাই আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তবুও তারা থেমে থাকেনি, থেমে থাকেনি তাদের জীবন। একে অপরের প্রতি মায়া-মমতা ভালোবাসা তাদের চলার পথকে আরো বেশি সুগম করে তুলেছে।

এই সবকিছুর মধ্যে মালোদের সংস্কৃতিকে বাদ দিলে চলে না। কালীপূজা, পিঠে-পার্বণ এর ধুমধামের পাশাপাশি রয়েছে মনসা পূজার ধুমও। গোটা শ্রাবণমাসে রোজ রাতে গাওয়া হয় পদ্মপুরাণ গান। আর শ্রাবণ মাসের শেষের দিন ঘরে ঘরে আয়োজন করা হয় মনসা পূজার। অন্য পূজার চাইতে এই পূজায় খরচ করে কম তবে আনন্দ হয় বেশি। ডুমুরের ফুলের মতো দুর্লভ মালোদের পুরোহিত। আর এই একজন পুরোহিত কে দশ বারো গায়ে ঘুরে পূজা করাতে হয় এই দিনে, তবুও এই দিনটির গুরুত্ব তাদের কাছে অনেক বেশি। আর এই বিশেষ দিনটিতে করা হয় জালাবিয়ার মত এক বিশেষ অনুষ্ঠান। ধানের চারা বা জালাই হল এই বিয়ের প্রধান উপকরণ। এক মেয়ে বরের মত সোজা হয়ে চৌকিতে দাঁড়ায় আরেক মেয়ে কনের মত সাতবার প্রদক্ষিণের মধ্যে দিয়ে এই এই জালাবিয়ার উৎসব পালন করে। তারপরে তাদের নৌকা-দৌড় (নাও-দৌড়ানি) প্রতিযোগিতা তো রয়েছেই। এই প্রতিযোগিতা নিয়েও তাদের মধ্যে বেশ হুডুম-দুডুম লক্ষ্য করা যায়, তার বর্ণনা উপন্যাসটির অনেকটা অংশ জুড়েই রয়েছে। তাই লেখক বলেছেন, রূপে রসে গঞ্জে ভরপুর ছিল মালোদের এই সংস্কৃতি।

“মালোদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মালমসলায় সে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। পূজায় পার্বণে হাসি ঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।”^৮

উপন্যাসের শেষপর্বে ‘ভাসমান’ শব্দটি উচ্চারণে আমাদের মনে এই অনুষ্ণু আসে যে তিতাসের স্রোতে ভাসমান। তবে প্রকৃতপক্ষে এর অভিব্যঞ্জনা-বিনাশের স্রোতে ভাসমান; আর উপন্যাসের শেষের দিকে এই বিনাশের কারণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমেই, যেখানে বাসন্তী ও অনন্তের সম্পর্কের ভাঙন দেখিয়েছেন লেখক সেখান থেকেই যেন মালোসমাজের ভাঙনের ইঙ্গিত পাচ্ছি আমরা। লেখক এক জায়গায় বলেছেন –

“মালোদের একতায় যেদিন ভাঙ্গন ধরিল, সেই দিন হইতে তাদের দুঃসময়ের শুরু। এতদিন তাদের মধ্যে ঐক্য ছিল ব্রজের মতো দৃঢ়, পাড়াতে তারা ছিল আঁটসাঁট সামাজিকতার সুদৃঢ় গাথুনির মধ্যে সংবদ্ধ। কেউ তাদের কিছু বলিতে সাহস করে নাই। পাড়ার ভিতরে যাত্রার দল ঢুকিয়া সেই ঐক্যে ফাটল ধরাইয়া দিল।”^৯

মালোদের সংস্কৃতিতে আঘাত হানে এই ‘যাত্রাগান’। মালোসমাজের ভাঙনের পেছনে এই ‘যাত্রাগান’ এর ভূমিকা অনিবার্য। যাত্রা গানের কারনেই মালোর ছেলেরা কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। হুঙ্কা ছেড়ে সিগারেট ধরল। গুরুজনদের প্রতিও তেমন শ্রদ্ধা ভক্তি রইল না। মালোরা ধীরে ধীরে আত্মসত্তা হারিয়ে ফেলল। তাদের ব্যক্তিত্বও ধীরে ধীরে লোপ পেতে লাগলো। সামাজিক নীতির বন্ধনও ক্রমে ক্রমে শ্লথ হয়ে আলগা হয়ে গেল। সামান্য বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ দেখা দিল। ক্রমে প্রতিদিনের নিত্য বিষয়ে তীব্র প্রতিযোগিতায় তারা নেমে এলো। অথচ এই সব কিছু একসময় মালোদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

মালোদের সংস্কৃতি হারানোর পাশাপাশি রয়েছে নাগরিক জীবনের হাতছানি, অনন্ত তারই শিকার হয়েছে। বিশিষ্ট সমালোচকের ভাষায় –

“একসময় যারা নদীর বুকেই জাল ফেলে দিন কাটিয়েছে, সংগ্রহ করেছে তাদের আহর। তারাই পরবর্তীকালে সে বৃত্তি থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। সামাজিক বিবর্তনের একটি ইশারা যেন তিতাসের গল্পে ঝিলকিয়ে উঠেছে। আদিম সাম্যবাদী সমাজের চেহারাটা ছিল পুরোপুরি আহাৰ্য্য সংগ্রহভিত্তিক - যা তিতাস পড়ের মালোদের জীবনে প্রথম পর্যায়ে প্রতিফলিত। ক্রমশ তিতাসের জলে নির্ভরশীল মাছমারাদের জীবনের খাঁচটা গেল বদলে, শুরু হবে জীবন-যাপনের পালা আহাৰ্য্য উৎপাদনে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় পৌঁছে দিয়েই ছুটি নিয়েছে অদ্বৈত।”^{১০}

তিতাস পাড়ের মালোদের না রইলো রোজগারের প্রতি মন না রইল প্রবাসে যাওয়ার উদ্যোগ। এমনকি একসময় তাদের প্রাণের চেয়ে বেশি মূল্যবান তিতাস এর খবরও রাখছে না তারা। রাধাচরণ মালোর তিতাসকে নিয়ে দেখা ভয়ংকর স্বপ্নের সম্মুখীন তারা হতে চায় না। চরটা ভাসমান হয়ে পড়লেও বাস্তবকে তারা হেঁয়ালি করতে থাকে। যার পরিণাম তাদের জীবন দিয়ে দিতে হয়। কেননা জল ছাড়া মাছেদের যেমন অবস্থা হয় তিতাসকে ছাড়া মালোদের অবস্থাও অনুরূপ। দীর্ঘকালের দলাদলির ফলে মালোরা একযোগে কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তিতাসে যেখানে একান্তভাবে মালোদের অধিকার ছিল সেখানে তিতাসের উপরে ভাসমান চরে তারা অধিকার স্থাপন করতে পারল না। ফলে যারা অনেক জমির মালিক যাদের জোর বেশি তিতাসের বুকে তারাই আবার নতুন জমির মালিকানা পেল। তাই যে নদীকে কেন্দ্র করে মালোজীবনের বিস্তার-বৃদ্ধি-সমৃদ্ধি, সেই নদী যদি হারিয়ে যায় শুকিয়ে যায় তাহলে এদের গোষ্ঠী জীবনের অস্তিত্বই বা টেকে কিভাবে। তাইতো উপন্যাস এর শেষে তিতাস নদীর পাশাপাশি মালোগোষ্ঠীকেও নিশ্চিহ্ন হতে দেখা গেছে।

Reference:

১. মল্লবর্মণ, অদ্বৈত, তিতাস একটি নদীর নাম, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৪, মাইতি বুক হাউস, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃ. ১৩
২. তদেব, পৃ. ৭২
৩. তদেব, পৃ. ৩৭
৪. তদেব, পৃ. ৮৩
৫. তদেব, পৃ. ৮৫
৬. তদেব, পৃ. ৮৬
৭. তদেব, পৃ. ১১৯
৮. তদেব, পৃ. ২৪১
৯. তদেব, পৃ. ২৩৮
১০. নস্কর, ড. সনৎ কুমার, সাহিত্য প্রবন্ধ, সেকালে একালে, প্রগতিবিকাশ, কলকাতা, সংযোজিত সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৫, পৃ. ২৮৪